এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: জবাবদিহিতায় বড় প্রশ্ন

অরুপ হাসান ও মাহি খান

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় অংশ পরিচালিত হয় এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ৯৩টি এবং এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৮৯৮ জন। দেশের মোট শিক্ষার্থীর বিশাল অংশ এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনা করে। রাষ্ট্রও এই বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাস্থলি পেমেন্ট অর্ডার বা এমপিও ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বড় একটি অংশ বহন করে আসছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বেতন-ভাতা, উৎসব বোনাস ও অন্যান্য সুবিধাও বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- সুবিধা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি আর্থিক শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? নাকি সরকারি অর্থের প্রবাহ বাড়লেও নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতার জায়গাটি এখনও রয়ে গেছে দুর্বল ও অবহেলিত? একটা সময় ছিল, যখন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবন ছিল সীমাহীন আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভরা। মূল বেতন ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো সুবিধা ছিল না বললেই চলে। বাড়িভাড়া ভাতা ছিল নামমাত্র, চিকিৎসা ভাতা ছিল অপ্রতুল, খুবই নগণ্য হারে উৎসব ভাতা দেয়া হতো, ছিল না বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সুবিধাও। দীর্ঘদিনের আন্দোলন, দেন-দরবার, মানববন্ধন, স্মারকলিপি এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক দাবির মুখে সরকার ধীরে ধীরে এ খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত কোনো বেতন স্কেল ছিল না। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে তারা সরকারি কোষাগার থেকে স্বল্প পরিমাণ মাসিক ভাতা পেতেন। স্বাধীনতার পর ভাতার পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও দীর্ঘদিন একই পদ্ধতি বহাল ছিল। ১৯৭৭ সালে শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা প্রথমবারের মতো জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় আসেন ১৯৮০ সালে। সে সময় থেকেই তারা মূল বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারি তহবিল থেকে পাওয়া শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এমপিও প্রথা চালু হয় এবং সরাসরি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। ধীরে ধীরে সরকারি অংশও বৃদ্ধি পেতে থাকে- সরকার ১৯৮৪ সালে ৬০ শতাংশ, ১৯৮৬ সালে ৭০ শতাংশ, ১৯৯৫ সালে ৮০ শতাংশ, ২০০০ সালে ৯০ শতাংশ এবং ২০০৬ সালে এসে ১০০ শতাংশ মূল বেতন প্রদান শুরু করে। এটি ছিল বেসরকারি শিক্ষকদের দীর্ঘ সংগ্রামের একটি বড় অর্জন। বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে চালু হয় অবসর সুবিধা ও উৎসব ভাতা। শুরুতে মূল বেতনের ২৫ শতাংশ হারে উৎসব ভাতা প্রদান করা হলেও বর্তমানে তা ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এমনকি এটিকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করার বিষয়েও সরকারের নীতিগত চিন্তাভাবনা রয়েছে। ২০১৮ সালের জুলাই থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরাও সরকারি কর্মচারীদের মতো নিয়মিত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট পেতে শুরু করেন। পাশাপাশি প্রতি বছরের জুলাই মাসে মূল বেতনের ১০ শতাংশ হারে বিশেষ সুবিধাও তাদের বেতনে যুক্ত হচ্ছে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর সম্প্রতি বাড়ি ভাড়া ভাতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত নভেম্বর থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের ৭.৫ শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা পাচ্ছেন, যা আগামী জুলাই থেকে ১৫ শতাংশে উন্নীত হওয়ার কথা রয়েছে। একই সঙ্গে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ এবং ২০২৫-এর মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের টাইমস্কেল সুবিধা চালু করা হয়েছে; পদোন্নতি ব্যবস্থাও তুলনামূলক সহজ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এসব পদক্ষেপ শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে এবং শিক্ষকতা পেশাকে কিছুটা হলেও মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গেছে। কারণ একজন আর্থিকভাবে অনিরাপদ শিক্ষক থেকে কখনও মানসম্মত শিক্ষা আশা করা যায় না। শিক্ষক যদি ন্যূনতম মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা না পান, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার ভিতও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই সরকারের এসব উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু বাস্তবতার আরেকটি দিকও রয়েছে, যা খুব কমই আলোচনায় আসে। সরকার যখন হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াচ্ছে, তখন এই আর্থিক সুবিধার বিপরীতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কি সরকারি আর্থিক শৃঙ্খলা ও জবাবদিহির নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করছে?সরকারের প্রাপ্য ভ্যাট, ট্যাক্স ও আয়কর কি যথাযথভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে আদায়কৃত অর্থের স্বচ্ছ হিসাব কি সংরক্ষিত হচ্ছে? বাস্তবতা বলছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরগুলো আশাব্যঞ্জক নয়।

> সরকার যখন হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াচ্ছে, তখন এই আর্থিক সুবিধার বিপরীতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কি সরকারি আর্থিক শৃঙ্খলা ও জবাবদিহির নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করছে? সরকারের প্রাপ্য ভ্যাট, ট্যাক্স ও আয়কর কি যথাযথভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে আদায়কৃত অর্থের স্বচ্ছ হিসাব কি সংরক্ষিত হচ্ছে?

সরকার ২০২৩ সালে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসংক্রান্ত নীতিমালা' প্রণয়ন করে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত সব ধরনের ফি ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে; নগদ অর্থ গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, এক খাতে আদায়কৃত অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ভ্যাট ও আয়কর কেটে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি নীতিমালা-২০২৪'-নীতিমালায়ও একই ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। এ নীতিমালায় মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ২৫টি এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের জন্য ২৬টি খাত অর্থ আদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে- মাসিক বেতন, ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি, ম্যাগাজিন ফি, পরিচয়পত্র ফি, দরিদ্র তহবিল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফি, রোভার স্কাউট, বিএনসিসি প্রভৃতি। এতেও খাতভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাতের বাইরেও বিভিন্ন নামে সৃষ্ট খাতে ফি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সব খাতের টাকা এক বা দুইটি ব্যাংক হিসাবের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। পৃথক হিসাব রেজিস্টার বা ক্যাশবই নিয়মিত সমন্বয় না করার ফলে কোন খাতে কত টাকা আদায় হলো, কত ব্যয় হলো, কত অবশিষ্ট আছে- তার সুনির্দিষ্ট হিসাব অনেক সময় পাওয়া যায় না। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য সংগৃহীত অর্থ, ম্যাগাজিন প্রকাশের অর্থ কিংবা সহশিক্ষা কার্যক্রমের অর্থ অনেক সময় কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবে ম্যাগাজিন প্রকাশ হয় না, নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় না, সাংস্কৃতিক চর্চাও হারিয়ে যায় আনুষ্ঠানিকতার ভিড়ে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, সরকারের প্রাপ্য ভ্যাট ও কর আদায়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের নীরব অনিয়ম চলমান। বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৫-১৫ শতাংশ পর্যন্ত ভ্যাট পরিশোধের বিধান রয়েছে। পাশাপাশি অগ্রিম আয়কর (এআইটি) কর্তনেরও নিয়ম আছে। কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব নিয়ম কার্যত উপেক্ষিত। বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যয় কিংবা অবকাঠামো নির্মাণে চচজ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়না। এমনকি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিভিন্ন সম্মানির ক্ষেত্রেও উৎসে কর কর্তনের সংস্কৃতি প্রায় অনুপস্থিত। পাবলিক পরীক্ষার প্রত্যবেক্ষণ, পরীক্ষা কমিটির কাজ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন কিংবা ব্যবহারিক পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের বিপরীতে শিক্ষকরা যে সম্মানি পান, সেখান থেকেও নিয়ম অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে তা অনুসরণ করা হয় না। ফলে বছরের পর বছর বিপুল অঙ্কের সম্ভাব্য রাজস্ব কর ব্যবস্থার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

সম্প্রতি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিবেদনে আরও উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের বিভিন্ন পরিদর্শনে ১ম দফায় ৪৭১ জন ও ২য় দফায় ২৬২ জন জাল সনদধারী শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করেছে। এর আগে ২০২৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬৭৮ জন জাল সনদধারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালনা কমিটির যথাযথ তদারকির অভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্রয় কিংবা যোগসাজশে জাল সনধধারী শিক্ষকরা সরকারের বিপুল অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ করেছেন। এখন তাদের এমপিও ও অবসর সুবিধা বাতিলের প্রস্তাব করা হলেও বাস্তবে তা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডিকে ঘিরেও দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বাস্তবে এসব কমিটি অনেক ক্ষেত্রে একটি প্রায় স্বায়ত্তশাসিত ক্ষমতা কাঠামো হিসেবে পরিচালিত হয়। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বাজেট প্রণয়ন, আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব থাকে নিরঙ্কুশ। তাত্ত্বিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসন এসব কমিটির কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব পালন করলেও মাঠপর্যায়ে সেই নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি অনেক সময় সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে কিছু প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি কার্যত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ক্ষমতার বলয়ে পরিণত হয়, যেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি বা রাজনৈতিক প্রভাবই মুখ্য হয়ে ওঠে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে এসব কমিটির গঠন ও ক্ষমতার ভারসাম্যও পরিবর্তিত হয়। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। শিক্ষক রাজনীতি, দলীয় আনুগত্য এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ শিক্ষার পরিবেশ ও মান- উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করে। এসব ঘটনা কেবল বিচ্ছিন্ন অনিয়ম নয়; বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলার গভীর দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে। শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর অনেক সময় পরিদর্শন ও

প্রতিবেদন তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অনিয়ম প্রতিরোধ, আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কিংবা জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য যে শক্তিশালী ও কার্যকর তদারকি কাঠামো প্রয়োজন, বাস্তবে তার ঘাটতি এখনও স্পষ্ট। রাষ্ট্র যখন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াচ্ছে, তখন একইসঙ্গে প্রয়োজন আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। খাতভিত্তিক ব্যাংক হিসাব বাধ্যতামূলক করা, ডিজিটাল আর্থিক

ব্যবস্থাপনা চালু করা, নিয়মিত অডিট নিশ্চিত করা এবং ভ্যাট-ট্যাক্স পরিশোধে কঠোর নজরদারি বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রশাসন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে সমন্বিত তদারকি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

কারণ শিক্ষা খাতে সরকারি বিনিয়োগ কেবল ব্যয় নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রাষ্ট্রের বিনিয়োগ। সেই বিনিয়োগের প্রতিটি টাকার সঠিক ব্যবহার এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান- সবার যৌথ দায়িত্ব। অন্যথায় সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও আর্থিক শৃঙ্খলার প্রশ্ন থেকেই যাবে, আর সেই প্রশ্নের ভার শেষ পর্যন্ত বহন করতে হবে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই।

(লেখকদের নিজস্ব মত)

[লেখকদ্বয় শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ সিভিল এডুকেশন সার্ভিস বিষয়ক থিংকার্স প্ল্যাটফর্ম দি অ্যাডভাইজর্স-এর সদস্য]